সংবাদ

তারিখ 9 MAY 2009

গ্রেডিং পদ্ধতির সংস্কার প্রয়োজন

তাসলিমা তামান্না

স্কুলে বরাবরই মাঝারি মানের ছাত্র সুমন রংপুরের একটি স্কুল থেকে ২০০৫ সালে এসএসসিতে জিপিএ- ৫ পেয়ে কৃতিত্বের সঙ্গে উত্তীর্ণ হন। মেধাবী এই ফলাফলের কারণে তিনি সহজেই ঢাকার নটর ডেম কলেজে ভর্তির সুযোগ পান। এখানে ক্লাসে খুব ভাল না করতে পারলেও ২০০৭ সালের এইচএসসিতে আবারও তিনি অর্জন করেন জিপিএ-৫। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনক হলেও এটা সত্য যে তিনি এরপরও ভাল কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তিরসুযোগ পাননি। এখন পড়ছেন জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে একটি কলেজে।

সুমনের মতো অবস্থা এখন অনেক শিক্ষার্থীর। জিপিএ-৫ পাওয়ার কারণে যারা একদিন আনন্দের জোয়ারে ভেসেছিলেন, কিন্তু পরবর্তীতে তাদের অনেকে ভাল কোথাও ভর্তির সুযোগ না পেয়ে চরম বিপাকে পড়েছেন। জিপিএ-৫ অর্জনই যে শুধু মেধার মাপকাঠি নয়, তারা অনেকেই হয়তো এখন বিষয়টি বুঝতে পারছেন।

শিক্ষা ব্যবস্থা আন্তর্জাতিক মানকরণের লক্ষ্যে ২০০১ সালে দেশে এসএসসি পর্যায়ে প্রথম গ্রেডিং পদ্ধতিতে চালু হয়। ওই বছর সারাদেশ থেকে জিপিএ-৫ পায় ৭৬ জন, যা ২০০৮ সাল এসে দাঁড়িয়েছে ৪১ হাজার ৯শ' ১৭ জন। একই অবস্থা এইচএসসি-এর ফলাফলের ক্ষেত্রেও। ২০০৩ সালে প্রথমবারের মতো সারা দেশ থেকে জিপিএ-৫ পেয়েছিলেন মাত্র ২০ জন। অথচ ২০০৮ সালে তা পৌঁছেছে ১৯ হাজার ১০৮ জনে। এসএসসি এবং এইচএসসিতে জিপি-৫ এর এই পরিমাণ বৃদ্ধি শিক্ষার গুণগত মান নিয়ে শিক্ষার্থী থেকে শুরু করে শিক্ষাবিদদের মধ্যে জাগিয়ে তুলছে নানা প্রশ্ন। অনেকেই চাচ্ছেন চলমান গ্রেডিং পদ্ধতির সংস্কার। জিপিএ-এর সংখ্যা বৃদ্ধির কারণে খুঁজলে দেখা যায় ২০০১ থেকে ২০০৩ সাল পর্যন্ত এসএসসি পরীক্ষায় কোন শিক্ষার্থী ৮টি বিষয়ে আলাদাভাবে এ+ (প্লাস) অর্থাৎ ৮০ থেকে ১০০-এর মধ্যে পেলে বলা হতো এই শিক্ষার্থীটি এ+বা জিপিএ-৫ পেয়েছে। কিন্তু ২০০৪ সাল থেকে ৫ থেকে ৭টি বিষয়ে আলাদাভাবে এ+বাকিগুলো এ বা ৭০ থেকে ৭৯-এর মধ্যে মার্কস পেলেই জিপিএ-৫ ধরা হয়। একই অবস্থা এইচএসসি-এর ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য।

প্রচলিত পদ্ধতিতে জিপিএ-৫ পাওয়া নিয়ে কথা হয় জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিসংখ্যান বিভাগের তৃতীয় সেমিস্টারের শিক্ষার্থী সাদিকুল ইসলাম পন্নীর সঙ্গে। তিনি বলেন, বর্তমান অবস্থা অবশ্যই সংস্কার করা প্রয়োজন। এতে সঠিকভাবে মেধা যাচাই হচ্ছে না। এ+প্লাসের ক্ষেত্রে ৮০ থেকে ১০০ মার্কস পাওয়া একইভাবে হিসাব করা হচ্ছে। কিন্তু ৮০ আর ৯০-এর ওপরে মার্কস পাওয়া কোনভাবেই সমান বিষয় নয়। এখানে মার্কস প্রাপ্তির মধ্যে একটা বিশাল পার্থক্য থেকেই যাচ্ছে। তার মতে এতে শিক্ষার মান নিচে নেমে যাচ্ছে। এ কারণে সংশ্লিষ্টদের বিষয়টির প্রতি আশু দৃষ্টি দেয়া প্রয়োজন। পন্নীর কথার সঙ্গে একমত প্রকাশ করলেন স্টামফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের দ্বিতীয় বর্ষের শিক্ষার্থী মুরশিদুজ্জামান হিমু। তিনি বলেন, বর্তমান পদ্ধতিতে ৬০ থেকে ৭৯ মার্কসের মধ্যে যদি দু'টি গ্রেডিং অর্থাৎ এ এবং এ- চালু থাকে তাহলে ৮০ থেকে ১০০ মার্কসের মধ্যে কেন দুটি গ্রেডিং করা যাবে না? তিনি আরও বলেন, শুধুমাত্র জিপিএ-৫-এর সংখ্যা বাড়লেই কখনও শিক্ষার মান বাড়ে না।

চলমান গ্রেডিং পদ্ধতি নিয়ে দেশের বিশিষ্ট শিক্ষাবিদদের যথেষ্ট আপত্তি রয়েছে। গ্রেডিং ব্যবস্থার সংস্কার প্রসঙ্গে কথা হয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজী বিভাগের অধ্যাপক ও বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ সৈয়দ মনজুরুল ইসলামের সঙ্গে। তিনি বলেন, বর্তমান পদ্ধতিতে অনেক ফাঁক রয়ে গেছে। এ+প্লাসের সংখ্যা এই পরিমাণ বৃদ্ধিতে শিক্ষার মানের ক্রমাগত অবমূল্যায়িত হচ্ছে। এই অবস্থায় এ+প্লাস পেলেই একজন শিক্ষার্থীকে মেধাবী বলে স্বীকৃতি দেয়া যায় না।

তিনি বিশ্বের উন্নত দেশের উদাহরণ দিয়ে বলেন, ওখানকার স্কুলগুলোতে সারা বছরের পড়াশোনার ভিত্তিতে গ্রেডিং করা হয়। কিন্তু আমাদের এখানে একটি মাত্র পরীক্ষার ভিত্তিতে যে গ্রেডিং ব্যবস্থা চালু রয়েছে তাতে গুণগত মান অনেক কমে যাচ্ছে। তিনি আরও বলেন, এখান থেকে যারা জিপিএ-৫ পেয়ে দেশের বাইরে পড়তে যাচ্ছে তারাও নানা ধরনের সমস্যায় পড়ছে। কারণ হিসেবে তিনি বললেন, এখানে ৮০ ভাগ মার্কস পেলেই এ+প্লাস ধরা হয়। কিন্তু বাইরের দেশগুলোতে তা করা হয় না। তার মতে, গ্রেডিং পদ্ধতির সংস্কার করতে হলে প্রাইমারী পর্যায় থেকে শিক্ষা ব্যবস্থা বদলানো উচিত। এ জন্য শিক্ষাখাতে বাজেট অনেক বেশি বাড়াতে হবে। পাঠ্যক্রম থেকে শুরু করে প্রশিক্ষণ পদ্ধতি, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ভৌত কাঠামো সবকিছু সমন্বিত করে উন্নত করতে হবে।

জিপিএ-৫ প্রাপ্তদের সংখ্যা ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধির কারণে অনেকেই শিক্ষার মান নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করে বিভিন্ন পত্রিকায় প্রতিবেদন লিখেছেন। ২০০৮ সালের ১৯ সেপ্টেম্বর একটি জাতীয় দৈনিক রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য ড. এম সাইদুল রহমান খানের 'পরীক্ষায় জিপিএ-৫ পাওয়া ও শিক্ষার মান' এক কথা নয়। প্রতিবেদনটিতে আরও বলা হয়, অমিত সম্ভাবনাময় শিক্ষার্থীদের পরীক্ষা হিসেবে নয় প্রকৃত শিক্ষার্থী করে গড়ে তুলতে অবশ্যই প্রচলিত শিক্ষা পদ্ধতির আমূল পরিবর্তন করতে হবে। এতে ত্রুটিপূর্ণ শিক্ষা ব্যবস্থা মেধা বিকাশের অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছে বলে উল্লেখ করা হয়। এ ব্যাপারে শিক্ষা মন্ত্রণালয়, শিক্ষা বোর্ড এবং শিক্ষক মণ্ডলীকে বিষয়টি গভীরভাবে অনুধাবন করে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেয়ার আবেদনও করা হয় প্রতিবেদনটিতে।

চলমান পদ্ধতি নিয়ে ২০০৮ সালের ২৪ সেপ্টেম্বর অপর একটি দৈনিকে কিশোরগঞ্জ সরকারি মহিলা কলেজের সহকারী অধ্যাপক বিধান মিত্রের 'এইসএসসি পরীক্ষার ফল। আনন্দের ওপিঠে বেদনা' শিরোনামে সময়োপযোগী একটি চমৎকার প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়। এতে শিক্ষার্থীর বাংলা এবং ইংরেজী সাহিত্যে ব্যাকরণ তথা ভাষা না বুঝে কিভাবে এ+প্লাস অর্জন করছে তা নিয়ে বিস্ময় প্রকাশ করা হয় অনেকটা কৌতুক করে। প্রতিবেদনটিতে আরও বলা হয়, দেশে যে পরিমাণ পাবলিক ও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় রয়েছে তাতে ওই বছর পাসের তুলনায় অর্ধেকের বেশি শিক্ষার্থীই উচ্চ শিক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হবে, যে কয়েক দিন আগেও জিপিএ-৫ আনন্দে নেচে উঠেছে তারা যখন কোথাও ভর্তির সুযোগ পাবে না তখন তাদের স্বপ্নভঙ্গ হবে বলে এতে উল্লেখ করা হয়।

দেশের শিক্ষাবিদরা যে শিক্ষার মান উন্নয়নের জন্য প্রতিনিয়তই ভাবছেন তা তাদের বিভিন্ন লেখনী এবং বক্তব্যে স্পষ্ট ফুটে ওঠে। ২০০৮ সালের ২৭ সেপ্টেম্বর বাংলাদেশ প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি এসোসিয়েশনের ভাইস চেয়ারম্যান আবুল কাশেম হায়দারের 'গ্রেডিং সিস্টেম নিডস এ্যাডজাস্টমেন্ট' শীর্ষক এক লেখায় নতুনভাবে গ্রেডিং পদ্ধতির একটি প্রস্তাবনা পেশ করা হয়; এতে বলা হয়, নর্থ আমেরিকান কারিকুলাম অনুযায়ী গ্রেডিং পদ্ধতি করা যেতে পারে এভাবে-৯০-৯৫ হবে এ+প্লাস, গ্রেডিং পয়েন্ট হবে ৫, ৯০-৯৪ হবে এ(৪.৭৫), ৮৫-৮৯ হবে এ-(৪.৫), ৮০-৮৪বি+ (৪.২৫), ৭৫-৭৯ বি (৪.০০), ৭০-৭৪ বি-(৩.৫), ৬৫-৬৯, সি+(৩.০০), ৬০-৬৪ সি(২৫.৫), ৫৫-৫৯ ডি+(২.০০), ৫০-৫৪ ডি (১.০০), ০০-৪৯ এফ (০.০০)।

চলমান গ্রেডিং পদ্ধতির সংস্কার নিয়ে অনেক আলোচনা হৈ চৈ হলেও প্রশাসন থেকে এখন পর্যন্ত সংস্কারের কোন পদক্ষেপ নেয়া হয়নি। এ ব্যাপারে ঢাকা বোর্ডের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্রে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তারা কোন মন্তব্য করতে রাজি হননি।

[নিউজ নেটওয়ার্ক]